তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের নক্‌সা ও নক্‌সা জাতীয় সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা

নক্‌সা সাহিত্যে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে নক্‌সা সাহিত্য কি সেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করা প্রয়োজন । উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য সংকীর্ণ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল থেকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেরিয়ে আসে। পরিবর্তন আসে বিষয়ে-রূপে-রীতিতে। নক্‌সা বলতে আমরা যেসব রচনাকে নির্দেশ করছি, সেগুলির উনিশ শতকের পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না। কেননা নক্‌সার বাহন গদ্য এবং সামাজিক উন্নতি করার প্রত্যক্ষ প্রবণতা; যা উনিশ শতকের পূর্বে ছিল না। সাহিত্যের বিচিত্র রসাস্বাদমূলক প্রকরণ নক্‌সা। নক্‌সা বলতে এক কথায় বোঝায়, পাঠককে সচেতন করার লক্ষ নিয়ে গদ্যে রচিত লঘু রসাত্মক বা রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনা। সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে, কথাসাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বের রচনাবলীকে এখানে নক্‌সা জাতীয় রচনা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে, সমকালের পাঠককে সচেতন করার লক্ষ নিয়ে বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গাকারে বাঙালী জীবনের সমস্যার রূপ নির্মাণে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন, এখানে তাঁদের রচনাকে নক্‌সা জাতীয় রচনা বলা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে গদ্যচর্চা ও নবগঠিত সমাজ বাংলা নক্‌সার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছিল। এই শতকের পূর্বে বাংলা গদ্য বলতে চিঠিপত্র বা দলিল বোঝাত, কিন্তু বাংলা গদ্য যে বিচিত্র ও গভীর ভাবের বাহক এবং ধারক হবার যোগ্য, উনিশ শতকের পূর্বে সে বিষয়ে ধারণাই ছিল না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় অনেকগুলি গদ্যগ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রথম ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেদ, বেদান্ত সম্পর্কিয় ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন নিগূঢ়তম তত্ত্বকে বাংলা ভাষায় গদ্যের আধারে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করলেন । গদ্যের মাধ্যমে যুক্তি মীমাংসা ইত্যাদি জটিল বিষয়ের বক্তব্যকে বোধগম্যতার ভাষায় রূপায়িত করার বিশেষ সময়েই আমরা নক্‌সাজাতীয় সাহিত্যের আবির্ভাব লক্ষ করি । ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) রচনার দ্বারা নক্‌সা সাহিত্যের সূচনা করেন ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রকৃত ভাগ্য নির্ধারক হয়। এই শতক থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের অনুকূলে এদেশে একটি দেশীয় স্তাবক-শ্রেণীর সৃষ্টি করে। স্তাবকবৃন্দ নতুন জমিদারী ও ব্যবসার দ্বারা প্রচুর অর্থ সম্পত্তির অধিকারী

হয় । এদের অধিকাংশেরই প্রকৃত শিক্ষা ও সচেতনতা ছিল না। চরম ভোগবিলাসকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করে । এই শ্রেণীর অর্থসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তির পোশাকী নাম 'বাবু'। বাবু সম্প্রদায় ভোগ বিলাসকে চরিতার্থ করতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ও নীতিভ্রষ্ট হয়, যা একাধারে তার নিজের পরিবার ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং জাতীয় জীবনে আত্ম-উন্মোচনে প্রধান বাধা। উনিশ শতকের চিন্তানায়কগণ আচারভ্রষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট বাবু সম্প্রদায় সম্বন্ধে চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁরা জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের জন্য নানামুখী নীতি-আদর্শের সূচনা ও প্রচার করেন। সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বাংলা গদ্যে রঙ্গব্যঙ্গ ও লঘুরসের দ্বারা নানারকম নীতি আদর্শের অবতারণা করেছিলেন। এই জাতীয় রচনাকে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

নক্সা ও নক্সা জাতীয় রচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হল সমাজ, দেশ তথা জাতীয় জীবনে হিতসাধনের প্রত্যক্ষ শুভেচ্ছা । বলা যায়, হিত সাধনের শুভ ইচ্ছা থেকেই নক্সা ও নক্সা জাতীয় রচনার সৃষ্টি । কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্য প্রকরণে সমাজ, জাতি তথা দেশের আত্ম-উন্মোচনের ভাবনা নির্ভর করে বিশেষ দেশ কাল পাত্রের উপর। শুধুমাত্র হিতসাধনের ইচ্ছে থেকে সাহিত্যের এইসব প্রকরণের সৃষ্টি হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ বা জাতীয় কল্যাণের আবেদন থাকলেও কবি বা লেখকের অবশ্যই লক্ষ থাকে প্রকরণটিকে যথাসম্ভব রসসমৃদ্ধ করার দিকটিতে। নক্সা জাতীয় রচনায় সাহিত্যরসের অবতারণা করার বিশেষ অবকাশ নেই। ব্যবহারিক জীবনে আমরা কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য নক্সা অঙ্কন করি। যেমন কোন একটি গ্রাম বা শহরের নক্সা তৈরী করার কারণ গ্রাম বা শহরটিতে কোথায় কী আছে তার একটি সামগ্রিক পরিচয় দান । নক্সা রচয়িতা সমাজ কল্যাণ বা জাতীয় কল্যাণের জন্য মানুষের ভুলত্রুটি নক্সাকারে পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। সেজন্য নক্সার লেখক প্রয়োজনে ইচ্ছেমত ব্যঙ্গ ও শ্লেষেরও আশ্রয় নেন। এর একটি-ই উদ্দেশ্য — পাঠক যেন সচেতন হয়ে জীবনের ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে লেখকের সমাজ কল্যাণ বা জাতীয় কল্যাণের মনোভাবের ইঙ্গিত বহন করে। বাংলা সাহিত্যে নক্সা জাতীয় রচনার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন;— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) 'নববিবিবিলাস' (১৮৩০) 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচাঁর নক্শা' (১ম খণ্ড ১৮৬২, ১ম ও ২য় খণ্ড ১৮৬৪), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "আপনার মুখ আপনি দেখ" (১৮৬৩), ক্ষেত্রমোহন ঘোষের কাকভূষুণ্ডীর কাহিনী (১৮৬৫), ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'নিশাচর' ছদ্মনামে 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫), রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের— 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (১৮৬৮), চুণিলাল মিত্রের 'কলিকাতার নুকোচুরি' (১৮৬৯) প্রভৃতি ।

উল্লিখিত একাধিক নক্সা ও নক্সা জাতীয় রচনার মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নব বাবু বিলাস', 'নব বিবি বিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'কে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রতিনিধিমূলক এইসব নক্সায় আলোচনা করা হবে জাতীয় জীবনের অন্ধকার দূর করার ক্ষেত্রে এগুলি কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭—১৮৪৮) নক্সাগুলি জাতীয় জীবনের আত্মবিকাশে কতখানি ভূমিকা পালন করেছে — এবিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে ব্যক্তি ভবানীচরণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় টাকশালের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। ধনাঢ্য নাগরিক পিতার সন্তান হওয়ায় সেকালের রীতি অনুসারে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় দক্ষ হওয়ায় তাঁর রাজকীয় কাজ ও অর্থোপার্জন করতে সুবিধা হয়, তিনি সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত হওয়ায় ভারতীয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বকথা অনুভব করতে সক্ষম হন এবং বাংলা ভাষায় দক্ষ হওয়ায় তাঁর বাংলা গদ্য রচনার পথ সুগম হয়।

কলকাতা শহরের মানুষগুলি ভবানীচরণের চোখের সামনেই আকাশ-পাতাল পরিবর্তিত হচ্ছে। নীতিহীনতা ও লক্ষভ্রষ্ট জীবন এদেরকে পেয়ে বসেছে। তাঁর চারপাশে অধিকাংশ দেশীয় মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। সমস্ত জীবন তিনি এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গিয়েছিলেন। এখানেই রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর মিল। কিন্তু এই মিল কর্মের পথে ছিল না। রামমোহন জীবনে যুক্তিকে প্রয়োগ করার কথা বলেন। আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাবতীয় আধুনিক বিষয়কে ত্যাগ করে ভারতীয় সনাতন আদর্শ, সনাতন ধর্ম, সনাতন সংস্কৃতিকে বরণ করে জীবনে প্রশান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি প্রথমে 'সম্বাদকৌমুদি' (১৮২১) ও পরে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) নামে বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন এবং 'ধর্ম্মসভা' (১৮৩০) নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করে নেতৃত্ব দেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 'ধর্ম্মসভা' ইতিহাসের বিচারে স্বদেশীয় ভাবধারা লালনপালনের প্রথম প্রতিষ্ঠানের বিরল সম্মান পেতে পারে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশীয় সংস্কৃতি লালনপালনের ভাবনাকে ব্যাপক প্রচার করার জন্য সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষাকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, দর্শন ও নিগূঢ় তত্ত্বকথার প্রকাশক হিসাবে গ্রহণ করেন। সেজন্যই তিনি একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। যেমন 'শ্রীমদ্ভাগবত' (১৮৩০), 'মনুসংহিতা' (১৮৩৩), 'ঊনবিংশ সংহিতা' (১৮৩৩?), 'শ্রীভগবদ্গীতা' (১৮৩৫)

প্রভৃতি । এসব ছাড়াও তিনি লঘুরস বা ব্যঙ্গরসের দ্বারা পাঠকের চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। এখানে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লঘুজাতীয় গদ্যরচনাগুলি আলোচিত হয়েছে।

নব বাবু বিলাস (১৮২৫)

লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নব বাবু বিলাস'-এর 'ভূমিকা'য় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার করেন। সেকালে কলকাতা ও তার আশপাশের 'চিতপুর', 'খিদিরপুর', 'ভবানীপুর', 'শিবপুর', 'চুচড়া', 'শ্রীরামপুর' প্রভৃতি অঞ্চলের বাবুকালচার প্রত্যক্ষ করে 'নববাবুবিলাসাবিধান' রচনা করেন । তিনি বলেন, এইসব নববাবু সম্প্রদায় "ধর্মকর্মানুষ্ঠানবিবর্জিত স্বীয়ধর্মচ্যুত অন্যধর্মাশ্রিত"। (১) স্বদেশীয় সমাজের এইসব জঞ্জালকে নির্মূল করতে লেখক এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে, যারা এই গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পড়বেন তাদের "স্ব স্ব রোষদোষ বিমোচন হইবেক" (২)। এই মহৎ উদ্দেশ্যে 'নব বাবু বিলাস' রচিত হয় ।

'নব বাবু বিলাস' চারটি খণ্ডে বিভক্ত। 'অঙ্কুর খণ্ড', 'অথপল্লব খণ্ড', 'অথ কুসুম খণ্ড' ও 'অথ ফল খণ্ড' নামে চারটি খণ্ডে নববাবুর আদ্যোপান্ত জীবনীর পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজে নতুন ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের আদর্শহীন শিক্ষা দানের ইতিহাস পাওয়া যায়; যা ভারতীয় টোল চতুষ্পাটির শিক্ষা নয়, আবার ইউরোপীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাও নয়। ফলে নীতিহীন, রুচিহীন কোলাহলময় জীবনকে নববাবুরা অনায়াসে গ্রহণ করে। জীবনটাকে এরা ভোগের চূড়ান্ত সীমায় পৌছে দেয়। গঠনমূলক চিন্তা চেতনাহীন বাবুরা সুরাপান, বারাঙ্গনা গৃহে গমন ও মোসাহেব পরিবৃত হয়ে থাকে। পরিশেষে নিজের পরিবারের সর্বনাশ ডেকে আনে । ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে দেখিয়েছেন, নববাবু চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে খেদ প্রকাশ করেছে। 'অথনববাবুর খেদ বর্ণনা' নামক পরিচ্ছেদে নববাবুর বিবেক দংশন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে নব বাবু তার কৃতকর্মের জন্য বিলাপ করেছে। যথা;—

"বহুশ্রমে পিতা করি ধন উপার্জন।
রেখেছিলেন প্রাণপণে আমারি কারণ।।
আমার কপাল গুণে বিদ্যা না হইল।
কুমন্ত্রী খলিপা কর্ণে কুমন্ত্রণা দিল।।

— — —

মতি ছিল নিরন্তর কুকর্মেতে আশা।
কুকর্ম করিয়া আমার এই দেখ দশা।।" (৩)

নব বাবু তার অসহ্য দুর্দশার জন্য মৃত্যু প্রার্থনা করে। নক্সাকার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন;—

"করহ উদ্ধার বিধি এ ঘোর সঙ্কটে ।

লয়ে যাও ত্বরা করি যমের নিকটে।।" (৪)

—কেননা ভোগবাদী উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে নববাবুর নানা রকম দুরবস্থা দেখা যায় । যথা;—নির্ধন হবার পূর্বে রক্ষিতার কাছে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়, নিকট আত্মীয়রা তাকে একঘরে করে, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করেও পাঁচটি কন্যা সন্তানের পিতা হতে হয়, কারাবাস করতে হয়। পরিশেষে সর্বস্বান্ত নববাবু বলে "তণ্ডুলাদি প্রতিদিন আনি ভিক্ষা মাগি।" (৫) গ্রন্থকার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবুর বিষাদময় চিত্র অঙ্কন করে সমকালের উচ্ছৃঙ্খল ও কোলাহলময় জীবনাচরণে আসক্ত বাবুদের এবং গ্রন্থের অন্যান্য পাঠককে আত্ম সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নেন ।

নব বিবি বিলাস (১৮৩২)

'নব বিবি বিলাস' যেন 'নব বাবু বিলাস'-এর কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপ। উচ্ছৃঙ্খল ও বেলেল্লাপনা জীবনকে যারা বরণ করে নিয়েছিল, তাদের অন্তপুরের গৃহবধূর পথভ্রষ্ট হওয়ার মর্মান্তিক নক্সা 'নব বিবি বিলাস'। কাহিনীর শেষে 'অথ নব বিবির বিলাপ' নামক অংশে নববিবির অনুশোচনা দেখান হয়েছে। একদা স্বামীর সোহাগ বঞ্চিতা গৃহবধূ অভিমানে অসংযমী ঘৃণ্য জীবনাচরণকে বেছে নেয়। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে তার মনে হয়েছে গৃহকোণই নারীর সঠিক আশ্রয়স্থল। নববিবি বলে;—

"আমার দুঃখের কথা করি নিবেদন ।
শুনিয়া সর্তক হও কুলনারীগণ ।।

— — —

ধর্ম রক্ষা কর সবে হইও না অসতী ।
অসতী হইলে পাবে অশেষ দুর্গতি ।।

— — —

সকল গৃহস্থকন্যা জানিবে নিশ্চয় ।
সুখভোগ ইহাতে কখন নাহি হয় ।।

— — —

অতএব পুন২ করি নিবেদন ।
কুলধর্ম রক্ষা কর কুলনারীজন ।।" (৬)

—লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবুর পাশাপাশি কুলনারীদের নিকট আবেদন করেন — তারা যেন ভারতের চিরাচরিত ধর্ম, আচার, রীতি বিসর্জন দিয়ে আধুনিক প্রচলিত সর্বনাশী জীবন অবলম্বন না করে।

'নব বিবি বিলাস'-এর কাহিনী অত্যন্ত বিষাদময়। যা পাঠ করলে নববাবু ও নববিবি সম্পর্কে সমাজের মানুষের মনে ঘৃণা জাগবে। পতি সোহাগ বঞ্চিতা অভিমানী গৃহবধূ এক কুট্টিনী নাপিতিনীর পরামর্শে দেহের উত্তেজনা চরিতার্থ করতে প্রথমে রাজি হয়। নব বিবি, বিবাহিত স্বামীর আশা ত্যাগ করে অসংযমী জীবনযাপন করে। কিন্তু যৌবন গত হলে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে দাসীবৃত্তি, কুট্টিনীবৃত্তি ও পরিশেষে ভিক্ষাবৃত্তির দুর্বিষহ জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়।

'নব বিবি বিলাস'-এর 'ভূমিকা'য় লেখক ভবানীচরণ গ্রন্থের উদ্দেশ্যের কথা বলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "যাঁহারা সুবোধ অথচ রসিক বাবু তাঁহারা কাহারো কাবু না হইয়া নববাবু ও নববিবি উভয়েরি নষ্ট চরিত্র দেখিয়া আপন২ চরিত্র পবিত্র করিতে পারিবেন যেহেতুক বিচক্ষণ লোক অন্যের দোষ বিলক্ষণ রূপে সমীক্ষণ পূর্বক আপন দোষ পরিহার করিয়া সাবধান হয়েন।" (৭)

—'নব বিবি বিলাস'-এর কাহিনীতে জানা যায় — নববাবুর চরিত্র দোষে নববিবির উদ্ভব এবং পরিণামে চরম দুর্গতির চিত্র। 'ভূমিকা'র শেষে লেখক তাই আশা ব্যক্ত করেন;— "ইহা শ্রবণে কুলবধূজনের মনে বেশ্যাদিগের দুরবস্থায় দুঃখ সম্ভাবনায় লজ্জা ও ভয় উভয় জন্মিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারিবেক..."(৮) এইসব বক্তব্যে লেখকের সুস্থ সমাজ গঠনের মনোভাব ধরা পড়ে।

কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩)

'কলিকাতা কমলালয়'-এর বিষয় ও ভূমিকা পাঠ করলে মনে হবে কলকাতার ব্যবহার, রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি পরিচয়ের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় লিখেছেন; —

> "এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন," (৯)।

লেখক এখানে কলকাতার স্পষ্ট পরিচয় উদ্‌ঘাটনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রন্থটি প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে রচিত। গ্রাম থেকে আগত এক ব্যক্তির কলকাতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন শহরবাসী এক ব্যক্তি। গ্রন্থটিতে চিত্রিত নক্‌সা সমকালীন কলকাতার ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু 'কলিকাতা কমলালয়' আগাগোড়া পাঠ করলে পরোক্ষে অন্য আর একটি উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে ভবানীচরণ আত্মসম্ভ্রমের পরিচয় দেন। উনিশ শতকের গোড়ায় লেখক অবক্ষয়িত সমাজের প্রেক্ষাপটে গ্রামবাসী ও শহরবাসীর প্রশ্নোত্তরের দ্বারা প্রমাণ করেন,— অভদ্র, অসচেতন, হঠাৎ টাকাওয়ালা অশিক্ষিত সমাজ জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় এনেছে। কিন্তু কলকাতার ভদ্র, চিত্তশুদ্ধ ও শিক্ষিত সমাজে অবক্ষয় আসে নি। তাঁরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেও স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন নি। এই বিষয়টি প্রকাশ করতে লেখক যথেষ্ট নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। এই গ্রন্থের দ্বারা তিনি ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। পরোক্ষে ভবানীচরণ ইঙ্গিত দেন, ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতিকে অবলম্বন করলে সমাজে ভদ্র, পবিত্র, শৃঙ্খলপরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনাচরণ করা যায়। পাঠক ও শ্রোতার নিকট এই কাঙ্ক্ষিত বার্তাটি পৌঁছান গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য, একথা বলা যায়।

বিদেশী ওরফে গ্রামবাসী সমকালের কলকাতার অবক্ষয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করেন;—"শুনিতে পাই কলিকাতার অনেক লোক আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন..."[১০]; উত্তরে নগরবাসী বলেন, আপনি যা শুনেছেন —তা 'যথার্থ' "কিন্তু এতাদৃশী রীতি হিন্দু মাত্রের প্রায় নাই তবে যদি কাহার থাকে সে কেবল হিন্দুবেশধারী হইবেক..."[১১]। ভবানীচরণ জোর দিয়ে বলেন যুগের পরিবর্তন এলেও ভদ্রলোকের কাছে হিন্দু আচার আচরণের মূল্য এখনও আছে। বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, দেশীয় শাস্ত্রের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি প্রসঙ্গে নগরবাসী বলেন এসব বক্তব্য পুরোপুরি ঠিক নয়। তাঁর ভাষায়;—

> "কেহ সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না তুমি ইহাই শুনিয়াছ কিন্তু সে ভ্রান্তিমাত্র দেখ অমুক২ বাবু কতপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ করিয়াছেন আর অনেক ভদ্রলোকের সন্তানেরা অগ্রে সংস্কৃতানুযায়ি বাঙ্গালা ভাষা ও লেখাপড়া অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ অর্থকরী ইংরাজী ও পার্সি বিদ্যা শিক্ষা করেন..."[১২]।

গ্রন্থের উল্লিখিত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে —যুগের প্রয়োজনে ইংরেজী ও পার্সী ভাষা শিখলেও সমকালে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বাংলা ভাষা চর্চা আদৌ বন্ধ হয় নি। লেখক এখানে ইংরেজীর মতো ভাষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করলেও দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে আপোষ করেন নি। উত্তরদাতা শহরবাসীর মুখ দিয়ে তিনি যেন তাঁর বক্তব্যের আবৃত্তি করান। লেখক যেন বলতে চেয়েছেন — সন্ধ্যাপূজা, দৈবকর্ম, পিতৃকর্মের মতো একান্ত দেশীয় পবিত্র সংস্কৃতির ক্রিয়াকর্মে বিদেশী ভাষা ব্যবহার অনুচিত কিন্তু বিষয়কর্মে, হাস্যপরিহাসে ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মে বিদেশী ভাষা ব্যবহার দোষের নয়।

'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থের লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ করেন— কলিকাতায় অনাচার নেমে এলেও দান-ধ্যান, আচার ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি ভারতীয় সনাতন বিষয়গুলি আজও

অব্যাহত। এসব পবিত্র বিষয় জীবনে অবলম্বন করলে জীবনের মান আরো উন্নত হবে । লেখকের এরকম মানসিকতায় ভারতীয় নীতি, ধর্ম, সভ্যতা, আচার প্রভৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার দিকটি স্পষ্ট হয় । সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষে যেন বলে দেয় ভারতবাসীর দুর্দিনে ভারতীয় রীতি-নীতি, আচার-ধর্মকে অবহেলা করলে জাতীয় মুক্তির পথ আরো কঠিন হবে ।

প্যারীচাঁদ মিত্র

উনিশ শতকের স্বনামধন্য এক চরিত্র প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল— অধ্যাত্মবাদে প্রগাঢ় বিশ্বাস, আধুনিক বিদ্যা শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা, সঙ্গে সক্রিয় সমাজকল্যাণ বা জনকল্যাণের মনোভাব । একাধিক বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থগুলি তাঁর জীবনাদর্শের প্রকাশরূপ । তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাকে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করে সমৃদ্ধ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ সমাজগড়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। সেজন্য তাঁর সব রচনায় তত্ত্বকথা, নীতিকথা, উপদেশ যথেষ্ট সক্রিয়, যা পাঠকের চেতনাকে বিকশিত করার যোগ্যতা রাখে ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমস্ত গ্রন্থে সমাজহিতৈষী ভাবনার আবেদন রাখলেও বিষয়বস্তু ও প্রকরণ গত ভিন্নতার কারণে তাঁর বাংলায় রচিত গ্রন্থগুলির চারটি শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যথা;—

(১) লঘুরস বা রঙ্গব্যঙ্গ রস প্রধান নক্সা জাতীয় রচনা—'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) ।

(২) নীতি আদর্শের প্রচার মূলক আখ্যান — 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'যৎ কিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) ও 'বামাতোষিনী' (১৮৮১)।

(৩) প্রবন্ধ জাতীয় রচনা —'কৃষি পাঠ' (১৮৬১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯)।

(৪) কাব্য জাতীয়—'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১)।

এখানে নক্সাজাতীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থ দু'টিকে। লেখকের অন্যান্য রচনার সঙ্গে এ দু'টি গ্রন্থের প্রধান পার্থক্য লঘুরসের প্রাধান্য ও রঙ্গব্যঙ্গের উপস্থিতি। যেমন; 'রামারঞ্জিকা' ও 'বামাতোষিনী'তে স্ত্রীকে আদর্শবাদী ও সচেতন করার জন্য অনেক গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা আছে । 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা'য় ঈশ্বর বিষয়ক কথার সঙ্গে নানারকম তত্ত্বকথা আছে । 'কৃষিপাঠ', 'ডেভিডহেয়ারের জীবনচরিত' ও 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'

গ্রন্থ তিনটির প্রকরণ গত নাম প্রবন্ধ হওয়ায় বলা যায় নক্সা জাতীয় রচনার সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। এছাড়া কাব্যজাতীয় 'গীতাঙ্কুর' নামক গ্রন্থটিতে অধ্যাত্মিক বিষয় থাকায় প্রকরণগত ও বিষয়গত উভয় ক্ষেত্রেই নক্সা জাতীয় রচনার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। আসলে প্যারীচাঁদ মিত্র রঙ্গব্যঙ্গ ও লঘুরস প্রধান নক্সা জাতীয় রচনায় বাঙালী জীবনকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেছেন কি না —সেই বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হবে।

আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)

বাবা-মার মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ ও আদর এবং বদসঙ্গ পেয়ে মতিলাল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমানুষ হওয়ার উপন্যাসধর্মী একটি আকর্ষণীয় কাহিনী 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ আছে। এই কাহিনীর সূত্রে সমকালের অনেকগুলি ছোটোখাটো চিত্র নক্সাকারে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থটিতে একদিকে উপন্যাসের লক্ষণ অন্যদিকে নক্সার ধর্ম উভয়ই উপস্থিত। সেজন্য খুব বির্তকে না গিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে বিশুদ্ধ নক্সা না বলে নক্সা জাতীয় রচনা বলা হল। আমার আলোচনার মূল বিষয় হল 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ কোন রকম আত্মসচেতন ভাবনা আছে কি না।

প্যারীচাঁদ মিত্র শিশুর প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে সুগভীর ভাবনা ব্যক্ত করেন 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে। তিনি দেখিয়েছেন একটি শিশুকে সুনাগরিক করতে হলে চাই উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ ও সুসঙ্গ। সমকালের কলকাতা বিশেষত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হঠাৎ বাবুদের নিকট সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার মানসিকতা পেয়ে বসে। প্রচুর সম্পত্তির মালিক হওয়ায় সন্তানের সুশিক্ষার ব্যাপারে কোন রকম অবহেলা করত না। এইসব নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী অনুভব করতে পেরেছিল এযুগে সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া খুবই জরুরি। নইলে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সম্মানের সঙ্গে টিকে থাকতে অসুবিধা হবে। কিন্তু অভিভাবকের এই সদিচ্ছা সবসময় সার্থক হত না। শিক্ষা সম্বন্ধে চেতনাহীন অভিভাবক শিশুকে আদর্শ পারিবারিক পরিবেশ ও সুস্থ সামাজিক পরিবেশ দিতে পারত না। সেকালের সমাজের এই বিশেষ চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের 'Preface' অংশে তিনি স্বীকার করেন

> "It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture, and is illustrative of the condition of Hindu society, manners, customs, &c. and partly of the state of things in the Moffussil."(১৩)

শিশুকে সঠিক নিয়মে প্রতিপালন করতে না পারলে বা সুশিক্ষা দিতে না পারলে পরিবার ও সমাজের পক্ষে কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, লেখক অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মূলত এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন ।

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কাহিনী এই রকম;—বুর্জোয়া বাবুরামবাবু একমাত্র সন্তান মতিলালের শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী তিনি মতিলালের জন্য বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু একাধারে শিক্ষকের অযোগ্যতা, অভিভাবকের অজ্ঞতা ও বদসঙ্গে মতিলাল অমানুষ হয়ে উঠে। মতিলাল নববাবু হয়ে ভোগ, বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতাকে জীবনের হেতু মনে করে। পিতৃ বিয়োগের পর তার বাবুগিরি পূর্ণতা পায়। মতিলালের অত্যাচারে পরিবার ও সমাজ জর্জরিত হয়। চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে পিতৃদত্ত ধন কিছু দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে আসে এবং এক সময়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। তার নিঃস্ব হওয়ার পিছনে মোকাজান মিয়া ওরফে ঠকচাঁচা ও বাঞ্ছারাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাহিনীর শেষে মতিলাল নিজের অশিক্ষা ও বদসঙ্গের জন্য বিবেক দংশনগ্রস্ত হয়ে কাশীতে এক সন্ন্যাসীর প্রেরণা ও আশ্রয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। কাহিনীর শেষে মা-ভাই-বোন-স্ত্রী সকলের কাছে বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যৌথ পরিবারের শান্তির নীড়ে ফিরে যায়। খুব সংক্ষেপে মূল কাহিনীটি এরকম ।

প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ নীতিঘেষা কাহিনী নির্বাচন করেন। নীতিমূলক করুণ রসাত্মক কাহিনী চয়নের পিছনে লেখকের সমাজ কল্যাণের ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কলকাতায় ইংরেজ সৃষ্ট একটি ধনাঢ্য গোষ্ঠী তৈরী হয়। এরা ইষ্ট ইণ্ডিয়াকোম্পানীর রাজত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সুসম্পর্ক রেখে প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল । অনেকের শিক্ষা-সচেতনতা ছিল তথৈবচ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্যারীচাঁদ মিত্র যখন এই গ্রন্থখানি লিখছিলেন তখনও এইসব বাবুদের অস্তিত্ব ছিল। এদের পরিবারেই মতিলালের মত অমানুষের জন্ম হত । যার বাবুগিরিতে বিপন্ন হত গোটাপরিবার ও সমাজ। প্যারীচাঁদ মিত্র যুগোপযোগী করুণ রসের কাহিনী নির্বাচন করে সমকালের পাঠককে সচেতন করার কথা ভাবেন। যাতে মতিলালের মত বদ্ চরিত্রের ছেলে সমাজে আর তৈরী না হয় । সুযোগ বুঝে লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র অনেকগুলি নীতি-উপদেশ দিয়েছেন। যেমন;—

ক) "ছেলেকে সৎ করিতে হইলে, আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত।" (১৪)

খ) "শিক্ষকের কর্তব্য, যে শিষ্যকে কতকগুলো বহি পড়াইয়া কেবল তোতা পাখী না করেন।" (১৫)

গ) "শিশুদিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবেক যে তাহারা খেলাও করিবে — পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত খেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভাল নহে।" (১৬)

ঘ) "সঙ্গদোষের ন্যায় আর ভয়ানক নাই। বাপ মা ও শিক্ষক সর্বদা যত্ন করিলেও সঙ্গদোষ সব যায়, যে স্থলে ঐরূপ যত্ন কিছুমাত্র নাই, সে স্থলে সঙ্গদোষ কত মন্দ হয়, তাহা বলা যায় না।" (১৭)

ঙ) 'লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য এই, যে সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র হইবে—সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে২ বিষয় কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাইরে সকল কর্ম ভালরূপ বুঝিতেও পারে — করিতেও পারে। কিন্তু এমত শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ মারও যত্ন চাই — শিক্ষকেরও যত্ন চাই।" (১৮)

চ) "ছেলে একবার বিগ্‌ড়ে উঠলে আর সুযুত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্তব্য, ...অতএব যে পর্যন্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে সে পর্যন্ত নানা প্রকার সৎ অভ্যাস করান আবশ্যক।" (১৯)

— শিশুকে মানুষ করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপদেশ ও শিক্ষাতত্ত্বগুলি আজও অনুসরণ করার মতো। একটি শিশুর জীবনে এইসব তত্ত্ব প্রয়োগ করলে সে অবশ্যই মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটিকে অধিক জনপ্রিয় ও প্রচার করার বাসনা লেখকের প্রথম থেকেই ছিল। 'ভূমিকা'য় তিনি বলেন—

> "অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি রচিত হইল।" (২০)

— আসলে প্যারীচাঁদ মিত্র জানতেন, বিষয়কে অধিক জনপ্রিয় করতে না পারলে মানুষের নিকট নিজের নীতি আদর্শ পৌছুবে না। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা সম্বন্ধে সমকালের পাঠকের নিকট প্রকৃত পথ ও মত তুলে ধরতে। তিনি হয়ত মনে করেন প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি প্রকরণে তাঁর কথা যথেষ্ট জনপ্রিয় হবে না। সেজন্যই সমকালের জনপ্রিয় প্রকরণ উপন্যাসকে বেছে নেন। অর্থাৎ 'আলালের ঘরের দুলাল' উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছে, একথা লেখকের বক্তব্যেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রসঙ্গত পুনরায় বলতে হয়, সে বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মনোভাব হল শিশুর অশিক্ষার ফলে অমানুষ হওয়ার বিপদ থেকে পাঠককে সচেতন করে তোলার মহৎ উপদেশ ।

'আলারের ঘরের দুলাল' রচনাটির ছোটোখাটো অনেকগুলি নক্‌সা বা চিত্র আছে, যেগুলি পাঠককে ভালোমন্দ বিবেচনা করতে শেখায়। যেমন — হিন্দু আচার ও সংস্কার, অন্তঃসারশূন্য বাবু ও তার পারিষদ, ধর্ম-সংস্কৃতির মতো ছোটোখাটো চিত্র ।

আচার সর্বস্ব হিন্দুর নিকট হিন্দুত্ব বা ধর্ম হল তিলোক পরা, কোশাকোশী নিয়ে পূজা করা, হরিনামের মালা জপা ইত্যাদি। মতিলাল পুলিশের কাছে ধরা পড়লে মুক্তির জন্য তার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ, স্বস্ত্যয়ণ, শিবপূজা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। মতিলালের বিয়েতে মোকাজান মিঞা বা ঠকচাঁচা উপস্থিত হলে জাত-পাত বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা হয়েছিল;—"হিন্দুর কর্মে মোছলমান কেন?" (২১) অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত আচার সর্বস্ব হিন্দুর কাছে সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন —এ বিশ্বাসের চাইতে জাতপাতের বিষয়টিই বড়। হিন্দু সমাজ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার মতো সামাজিক ব্যাধিতে জর্জরিত । এই সব চিত্রকে লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন । বালক মতিলালের বিয়েতে বেণীবাবু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন;— "অসময়ে বিবাহ দিলে ছেলের নানা প্রকার হানি করা হয়।" (২২) বহু বিবাহের চিত্রটি ফুটে উঠে বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের দ্বারা । বেণীবাবু প্রসঙ্গত বলেন—"এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম বজায় রাখিতে চাহে সে এ কর্ম কখনই করিতে পারে না।" (২৩) কুলীন মেয়েদের জীবনে ভয়ঙ্কর কৌলীন্য প্রথার চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বাবুরামবাবুর দুই কন্যা মোক্ষদা ও প্রোমদার যন্ত্রণাময় জীবন চিত্রের দ্বারা। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার মত প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে প্যারীচাঁদ মিত্র অবাঞ্ছিত ও কুসংস্কার হিসাবে চিত্রিত করেন। ধর্মের প্রকৃত অর্থ সেকালে বেশীরভাগ মানুষের কাছে ছিল অস্পষ্ট। ধর্ম বলতে তাঁরা আচার প্রথাকেই মনে করতেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনাতেই দেখা যায়, বরদাপ্রসাদের মতো ব্যক্তির নিকট প্রচলিত আচার সর্বস্ব ধর্মের চাইতে শুদ্ধ চিত্তে পরমেশ্বরের স্মরণ ও পরহিতৈষী হওয়ার মূল্য বেশী। বরদাপ্রসাদের আদর্শে মতিলালের ছোটো ভাই রামলাল প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে ।

উনিশ শতকে বাবু কালচার সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক দিক ছিল 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ বাবুরামবাবু ও মতিলালের চরিত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায় । মোসাহেব পরিবৃত কাণ্ডজ্ঞানহীন বাবুর জীবনাচরণ, স্বার্থপর মন্ত্রণাদাতার পরামর্শ বাবুর সর্বনাশ ডেকে আনে । এই সর্বনাশ বাবুর গোটা পরিবারকেও দুর্দশার সম্মুখীন করে তোলে । লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বাবুর উৎসভূমি সমকালীন অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করে শিক্ষা বিষয়ে পাঠককে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন, যা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর রচয়িতার দায়িত্বপূর্ণ মনোভাবকে মনে করিয়ে দেয় ।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর উদ্দেশ্যের সাফল্য, লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রকে 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' রচনায় উৎসাহিত করে। গ্রন্থটিতে স্পষ্টত দু'টি অংশ। মদ্য পানের ধ্বংসাত্মক দিক ও সমকালের বিপন্ন হিন্দুত্ব তথা জাত রক্ষা করার নামে ভ্রষ্টচারিতার চিত্র । এখানে নববাবুর মদ্যপান ও প্রাচীনপন্থীর

জাত রক্ষার নামে বাগাড়ম্বর, অলসতা, নেশাখোর ও নিষ্কর্মা মনোভাবের বিরুদ্ধে বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি এই গ্রন্থে রঙ্গব্যঙ্গ, উপদেশ ও নীতিকথার দ্বারা পাঠকের সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে দায়িত্ব পালন করেন।

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'— এর রচনা কাল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং পটভূমি উনিশ শতকের ইংরেজ রাজত্বকাল। লেখক দেখেছিলেন সমকালের ভ্রষ্টচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেলেল্লাপনার ভয়ঙ্কর বিচিত্র দৃশ্য। মদ্যপান এইসব উপসর্গগুলিকে সার্থক করে তোলে। প্যারীচাঁদ মিত্র নক্সার দ্বারা পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন—মদ্যপান একটি ব্যাধি, যা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এজন্য তাঁকে অনেক নীতি উপদেশ প্রচার করতে হয়েছিল। যেমন;—

ক) "মদ্য পানে যে কেবল শরীর নষ্ট হয় এমত নহে; শরীরের সঙ্গে বুদ্ধি ও ধনও যায়।" (২৪)

লেখক সমকালের পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন মদ্যপান করলে স্বাস্থ্য নামক সম্পত্তির ক্ষতি হয়। তিনি বলেন অধিক মদ্যপায়ীর প্লীহা, পক্ষাঘাত ও নানা জাতীয় ভয়ঙ্কর রোগ হয়। শুধু তাই নয় মদ্যপান মানে অর্থের ক্ষতি ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ। কেননা মদ্যপায়ীর বুদ্ধি কাজ করেনা।

খ) "বাঙ্গালিরা মদ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রায় মদে তাহাদের খায়," (২৫)

প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে বাঙালীর মদ্যপানের অতিরঞ্জনকে নির্দেশ করেন। বাঙালী একবার মদের স্বাদ পেলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মদ নিয়ে পড়ে থাকতে চায়। তখন চারদিক থেকে সর্বনাশ এসে তাকে গ্রাস করে।

গ) "বিদ্যা শিক্ষার সময় ধর্ম বিষয়ে উপদেশ না হইলে বড় অহঙ্কার হয়, কেবল ইংরাজী চলন ইংরাজী কথোপকথন ও ইংরাজী ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়।" (২৬)

সমকালের ধর্মজ্ঞানহীন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনাদর্শকে লেখক নির্দেশ করেন। এখানে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে দেশীয় ধর্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।

ঘ) "সংসারে নৈরাশ্য বিষাদ সন্তাপ বিয়োগ ইত্যাদি নানা উৎপাত ও আপদ সর্বদাই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি তত্তৎ অবস্থায় সুস্থির হইয়া মনঃসংযম করিতে আরো রত হন। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই যে, পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা প্রেরিত, তাহাই মঙ্গলজনক।" (২৭)

এখানে লেখক বলেন ধার্মিক ব্যক্তি বিপদের সময় অধৈর্য্য ও অসংযমী হন না । কেন না ধর্ম মানুষের চিত্ত শুদ্ধি ঘটায়, হিতাহিত জ্ঞানের প্রখরতা বৃদ্ধি করে। উল্লিখিত নীতি কথায় মদ্যপানের অপকারিতা ও ধর্মজ্ঞানের উপকারিতার কথা প্রাকশ পেয়েছে। এই গ্রন্থেরই দু-একটি নক্সা থেকে মদ্যপানের অপকারিতার বিষয়টি তুলে ধরা হবে ।

ভবানীবাবু কলেজের ছাত্র, স্বচ্ছল পরিবার, কিন্তু নীতি শিক্ষার অভাবে জীবনকে ঠিক পথে চালিত করতে পারে নি। অধিক সুখের আশায় মদ্যপান শুরু করে । মদ্যপান করতে গিয়ে ধীরে ধীরে মদই তাকে পান করতে থাকে। ভবানীবাবু তার মা, স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় । সমস্ত অর্থ সম্পত্তির ক্ষতি করে সপারিষদ মদ খেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে । প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন —

> "পিতা যৎকিঞ্চিৎ যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে২ দশ জনে লুটে পুটে লইতে আরম্ভ করিল। ...একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথা এড়িয়ে যায় নাই।" (২৮)

—অভিজ্ঞ ডাক্তার হেয়ার সাহেবের সুচিকিৎসায় ভবানীবাবু এ যাত্রায় সুস্থ হল। কিন্তু পুনরায় নেশাগ্রস্ত না হওয়ার জন্য ডাক্তারবাবু তাকে সতর্ক করেন। ভবানীবাবুও অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে সৎ ও সুস্থ জীবনযাপনের কথা ভাবে। সওদাগরের বাড়িতে একটি ভাল কাজও পেয়ে যায়। কিছু দিনের মধ্যেই এরকম নেশাহীন এক ঘেয়েমি জীবন সম্বন্ধে বিরক্তি আসে। কিন্তু পুনরায় মদ্যপায়ী হলে এবার গুরুতর অসুস্থ হয় এবং পরিবার পরিজনকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঠেলে দিয়ে মদ্যপানের চরম পরিণতি মৃত্যুকে বরণ করে।লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে দেখাতে চেয়েছেন মদ্যপায়ী হওয়ায় ভবানীবাবু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

মদ্য পান বিষয়ে আর একটি আকর্ষণীয় নক্সা জয়হরিবাবুকে নিয়ে রচিত হয়েছে। জয়হরিবাবু যশোহরের মানুষ, ইংরেজী শিক্ষিত। কলকাতায় এসেছে ভালো কাজের আশায়। কিন্তু কাজ না পেলে তাকে হতাশা-নিরাশা পেয়ে বসে। জয়হরি ধীরে ধীরে সমকালীন কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণে জড়িয়ে পড়ে। মদ্যপান ও বদসঙ্গে পড়ে পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে শেষে অপরাধ মূলক কাজ-কর্মের অভিযোগে কারারুদ্ধ হয় ।

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'-এ পক্ষীরাজ আগড়ভমসেন বাবুর নক্সা বেশ রঙ্গব্যঙ্গ মূলক । নেশাখোর অলস পক্ষীরাজ আগড়ভমবাবু বিয়ে করে রাজত্ব ও রাজ কন্যা লাভের স্বপ্নে বিভোর হয়। এরকম দিবাস্বপ্নে তাকে কিরকম নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল, তার একটি উপভোগ্য ব্যঙ্গমূলক চিত্র এখানে রয়েছে ।

মদ্যপান যে একটি সামাজিক ব্যাধি লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'-এর প্রথমাংশে পাঠকের কাছে প্রকাশ করে কৌশলে পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন।

ভারতের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ও সংস্কৃতি আছে। উনিশ শতকে বাঙালীর ধর্ম এবং সংস্কৃতি উগ্র নব্যপন্থী, সংকীর্ণ প্রাচীনপন্থী ও ধনাঢ্য অনুকরণকারীর ক্রিয়াকলাপে বিকশিত হতে না পেরে সর্বনাশের খাদে নিমজ্জিত হয়। প্রগতিশীল একটি গোষ্ঠী জাতির প্রকৃত ধর্ম ও সংস্কৃতি উদ্ধারে তৎপর হয়। 'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'—গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে অলস, উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্কর্মা বাবু ও হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারীর হিন্দুত্ব রক্ষার নামে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে লেখক প্রকাশ করেন। 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা' [২৯] নামক শিরোনামের রচনাংশে ভবশঙ্করবাবু ও তাঁর পারিষদ বাচস্পতি, গোস্বামী ও প্রেমচাঁদ প্রমুখ মদ্যপান করে জাতির পবিত্রতা রক্ষা করার স্বপ্ন দেখে। এখানে ধর্ম বা জাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, নেশাখোর, বাগাড়ম্বরপ্রিয়, নিষ্কর্মা বাবুসম্প্রদায়ের ধর্ম রক্ষা করার উদ্যোগকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতায়' [৩০] নামক শিরোনামের রচনাংশে সমকালের কলকাতার বেলেল্লাপনা, মাতলামী, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি নেতিবাচক চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,— এর ফলে জাতি বিপন্ন হয়েছে ও ধর্ম বিকৃত আকার পেয়েছে। তিনি পাঠকের নিকট জাতীয় সমস্যা কৌশলে তুলে ধরে পরোক্ষে সচেতন করার চেষ্টা করেন। 'বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার' [৩১] নামক পরিচ্ছেদে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক কৌলীন্য প্রথার চিত্র অঙ্কন করেন। এইসব কুলীন ব্রাহ্মণের অলসতা, বাক্‌পটুতা ও ব্যভিচার পাঠকের মনে ঘৃণা উদ্রেক করে। পাঠককে আত্মসচেতন করে তুলবার পক্ষে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কুলীন ব্রাহ্মণের নক্‌সা বড় ভূমিকা পালন করে।

অতএব প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' নামক রঙ্গব্যাঙ্গমূলক রচনার দ্বারা পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন — এমন দাবী করলে অতিশয়োক্তি হয় না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১ম খণ্ড ১৮৬২, ১ম ও ২য় খণ্ড ১৮৬৪) বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমাদের আলোচনার বিষয় 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বাঙালীর জন্য কোন রকম হিত ভাবনা আছে কিনা। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করা যাক। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-কে লিখেছেন — এ বিষয়ে বিতর্ক আছে। বিতর্কের জটিল সমস্যায় না গিয়ে বরং অধিকাংশ গবেষক ও সমালোচকের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলতে পারি — 'হুতোম

প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্ন সিংহ সল্পায়ু ছিলেন (১৮৪০-১৮৭০)। তবু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উনিশ শতকের সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিখ্যাত অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনপঞ্জীর যে তথ্য দিয়েছেন তাতে সংস্কৃতি চেতনা ও দেশানুরাগের পরিচয় আছে। যথা;—

"...সাংস্কৃতিক কর্মে যোগদান—বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫১), বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৬), বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫) প্রতিষ্ঠা।

পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা — বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫), সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা (১৮৫৬), বিবিধার্থ সংগ্রহ (শেষ আটটি সংখ্যা সম্পাদনা, ১৮৬৮ বৈশাখ—অগ্রহায়ণ), পরিদর্শক (দৈনিক পত্রিকা, পরিচালক ও সম্পাদক, ১৮৬৩)।

দানশীলতা — স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য মাসিক দান, 'সংবাদ প্রভাকরের' বার্ষিক সম্মেলনে লেখকদের আর্থিক সহায়তা, সাহিত্য রচনার জন্য পুরস্কার প্রদান, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন (১৮৬১), সংবাদ প্রভাকর, ব্রাহ্মসমাজ, Hindu patriot প্রভৃতিসাময়িক পত্র ও প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ছাত্র ও তরুণ লেখকদের পুরস্কৃত করা।

মহৎকর্ম ও সমাজসংস্কারে যোগদান—বিধবা বিবাহে সহায়তা, নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক রেভাঃ লঙ সাহেবের জরিমানার সমস্ত আর্থিক দণ্ড প্রদান, বিধবা বিবাহকারীদের এক হাজার টাকা পুরস্কার (১৮৬৫), সোমপ্রকাশে আর্থিক সাহায্য (১৮৬২), Bengalee পত্রের জন্য মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় (১৮৬২), Hindu petriot-কে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা (১৮৬১), Mukherjee's Magazine-এর জন্য (একহাজার টাকা) মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করে দান, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নিরোধে বিপুল অর্থ সাহায্য, দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, জনসাধারণের পানীয় জলের জন্য চারটি ধারাযন্ত্র (Fountain) বিদেশ থকে এনে কলকাতার প্রধান রাস্তায় স্থাপন, উদ্ধত ইংরেজ বিচারকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাঙালি হিন্দুর নেতৃত্ব, দক্ষতার সঙ্গে বিচার কার্য নির্বাহ করার জন্য দেশী ও ইংরেজ সমাজে সম্মানিত।"(৩২)

অতএব বলা যায় — উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক জগতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এক অবিস্মরণীয় নাম।

প্রথমে আলোচনা করা হবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র বিষয় ও গ্রন্থের নামকরণই বা এমন হল কেন ?

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র পটভূমি তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের রাজধানী কলকাতা এবং বিষয় সুস্থ সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে কীটের মতো ক্ষতিকারক দিকগুলি। যেমন; কলকাতার মানুষের হুজুক প্রিয়তা, বুজরুকি পোষকতা, দেবউৎসবে ভক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধবিশ্বাস, বাবু কালচার প্রভৃতি । কালীপ্রসন্ন সিংহ ভেবেছেন এই বিষয়গুলোর অপকারিতার বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে নক্‌সা রচনা করা । তাতে সমাজের উক্ত বিষয়গুলিকে অনেকটা অবিকৃত করে পাঠকের নিকট তুলে ধরা যাবে । সেজন্য লেখক গ্রন্থটির নাম 'আরসি' রাখতে চেয়েছিলেন । তাঁর ভাষায়;—

> "নক্‌শাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন," (৩৩)

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এজাতীয় নামকরণ থেকে লেখক কোন কারণে পিছিয়ে আসেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বাঙালী জীবনের মন্দ দিক ও সঙ্গে ভাষার অবিকৃতি থাকায়—মনে হবে লেখক গালাগালি দিচ্ছেন । সম্ভবত লেখকও এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সেজন্যই গ্রন্থটি ছদ্মনামে পাওয়া যায় । প্যাঁচা যেমন 'Rod Cells'-এর সাহায্যে রাতের অন্ধকার পৃথিবীকে স্পষ্ট দেখতে পায়, ঠিক তেমনি কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোমও সমকালের কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে মন্দ বা অন্ধকার দিকগুলি স্পষ্ট দেখতে পান । এবং মন্দ দিকগুলি পাঠকের নিকট তুলে ধরে পাঠককে আত্মদর্শন করিয়ে সচেতন করতে চান । মনে হয় সেজন্যই গ্রন্থটির নাম 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রাখা হয়েছে ।

আমরা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রকৃতউদ্দেশ্য কি তার অনুসন্ধান করব। প্রথমবারের 'ভূমিকা' উপলক্ষে একটা কথা'য় লেখক বলেছেন,—

> "আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে, বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেম্‌নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান্ থাক্‌তো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে পেতো না—তা হলে হয়ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন; কেউ বা কয়েদ থাকতেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয় । কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেশির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্‌শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো ।" (৩৪)

স্বয়ং গ্রন্থকার স্বীকার করেছেন সমসাময়িক কালের বাংলা গ্রন্থগুলি যা খুশি তাই নিয়ে লেখা হচ্ছে। যদি বাংলা ভাষার কেউ 'ওয়ারিস' থাকত তাহলে অনেক গ্রন্থকারকে হয় ফাঁসিতে ঝুলতে হত নয়ত কয়েদী হতে হত। উক্ত স্বীকারোক্তি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে মনে হবে গ্রন্থগুলির মান অতিসাধারণ, কিংবা সমাজের পক্ষে হয়ত ক্ষতিকারক । তাহলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' কি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক গ্রন্থ? হুতোমই বলেন;— "ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয় তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম তত দূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন।"(৩৫) তা হলে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? উত্তরটি আমরা লেখকের ভাষায় শুনবো—"অনেকে সুদ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে।" (৩৬) 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় একটি সঞ্জীবনী শক্তি রয়েছে যা সমাজের উন্নয়নে বিশেষ উপযোগী । অতএব 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সমাজের ক্ষতিকারক কোন গ্রন্থ নয়, বরং সমাজের উপকারের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে ।

বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় অনেকগুলি সামাজিক চিত্র পাব, যথা;— হুজুক, বুজরুকি, দেব উৎসবে ভক্তি গৌণ, মুখ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ বিশ্বাস, বাবু কালচার প্রভৃতি নেতিবাচক বা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক দিক; সঙ্গে দেশ প্রেমের ভাবনা ও প্রত্যক্ষ নৈতিকতারও অবতারণা ইত্যাদি। দেশপ্রেম ভাবনা ও নৈতিকতার অবতারণা ব্যতীত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র সামাজিক নক্‌সাগুলি সমাজ বা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।নক্‌সাকার কালীপ্রসন্ন সিংহ সেইসব চিত্রগুলি পাঠকের কাছে তুলে ধরে পরোক্ষে পাঠকের নীতিবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। আমাদের মনে হয়েছে যাঁরা দেশ প্রেমিক, সমাজ হিতৈষী, তাঁদের চোখে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সমাজ বা দেশের ক্ষত নিবারণের জন্য বিশল্যকরণীর মতো একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ । একথা বলা যায় — যা পাঠ করলে নৈতিকতায় সমৃদ্ধ মানব সম্পদ বৃদ্ধি হবে। 'হুতোম' সেই জন্যই বোধ হয় পাঠককে জানিয়েছেন;—

> "যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্বসময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন।" (৩৭)

এবার 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থের ইতিবাচক ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আমরা ধারাবাহিকভাবে 'হুজুক', 'বুজরুকি', দেবউৎসবে ভক্তি গৌণ, মুখ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ বিশ্বাস, বাবুকালচার, দেশপ্রেমের ভাবনা ও নৈতিকতার চিত্রগুলি আলোচনা করব।

হুজুক ঃ

বাঙালী সমাজে কর্মভীরু নিষ্কর্মার উপস্থিতি নক্সাকার কালীপ্রসন্ন সিংহকে ভাবিয়েছিল। এই কর্মভীরু নিষ্কর্মা সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করা 'হুজুক' নামক নক্সার অন্যতম বিষয়। যারা অগভীর চিন্তাশীল, নিষ্কর্মা তাদের দ্বারা সমাজতো উপকৃত হবেই না বরং ক্ষতি হওয়ার প্রবণতা অধিক, অনেকটা সমাজের পক্ষে বোঝার মতো। সমাজে এইসব মানুষের পরিবর্তন না হলে বাঙালীর জাতীয় জীবনে অবক্ষয়ের গতি থামবে না। সে জন্য লেখক বলেন;—

> "পাঠক! যত দিন বাঙ্গালির বেটর অকুপেশন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফর্ম্মেশন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই।"(৩৮)

সমাজের ভালো পেশা বা কর্মসংস্থান সামাজিক বা পারিবারিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ নিষ্কর্মা সৃষ্টির পিছনে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের সমালোচনা করা হয়েছে। অতএব নিষ্কর্মার দল যত দিন সমাজে থাকবে তত দিন 'হুজুক' নামক ব্যাধিটির অবসান হবার নয়। বলা যায় — সুশৃঙ্খল ও উন্নত সমাজগঠনের পরিপন্থী। এইসব মানুষগুলি—

> "দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আজ্‌গুব হুজুক তুল্‌বে, তার বড় বিচিত্র নয়!" (৩৯)

কালীপ্রসন্ন সিংহ নিষ্কর্মা লোকেদের দ্বারা সৃষ্ট একাধিক নক্সাচিত্র অঙ্কন করেন। 'ছেলেধরা', 'প্রতাপচাঁদ', 'মহাপুরুষ', 'কৃশ্চানি হুজুক', 'মিউটনি', 'মরাফেরা', 'সাতপেয়েগরু' নক্সাগুলি উল্লেখ করা যায়। উল্লিখিত একাধিক নক্সার মধ্যে 'মরাফেরা' নামক 'হুজুক' নক্সাটির আলোচনা করা হচ্ছে। হুজুক উঠল দশ বছরের মধ্যে যারা মরেছে তারা আগামী ১৫ই কার্ত্তিক ফিরে আসবে। সঙ্গে হুজুক উঠল এই কথাটি "নদের রামশর্ম্ম আচায্যি গুণে বলেচেন।" (৪০) আরো বলা হল স্বর্গের কোন দেবতার বিয়ে উপলক্ষে এরকম একটি উদ্যোগ। এই হুজুক প্রচারিত হওয়ায় সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। গ্রন্থকারের ভাষায়;—

> "...বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যেসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মেছিল, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্‌মমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্‌লো।"(৪১)

হুজুকে প্রভাবিত হয়ে ১৫ই কার্ত্তিক অনেকেই নিকট আত্মীয় ফিরে পাওয়ার আশায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে গেল। রাত ১০ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর অনেকে মরার মত হয়ে বাড়ি ফিরল। এভাবেই "মরা ফেরার হুজুক থেমে গ্যালো!" (৪২)

'হুজুক' নামক নক্সায় এইসব আজগুবি গালগল্প ও গল্পকার সম্বন্ধে বাঙালী পাঠককে সচেতন করাই লেখকের উদ্দেশ্য ।

বুজরুকি ঃ

বুজরুকি বা ভণ্ডামী একটি সামাজিক ব্যাধি। এই বুজরুকি সুস্থ সমাজের পক্ষে মোটেই সুখবর নয় । সমকালের কলকাতায় শিক্ষিত সমাজে বুজরুকির প্রভাব কমলেও অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে এর প্রভাব বেশ মারাত্মক। নক্সাকার কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেন;—

> "যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ কিমিয়া ও ভূতত্ত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজকাল ইংরাজি লেখাপড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কল্‌কেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই;" (৪৩)

সমাজে বুজরুকির চিত্র অঙ্কন করে তিনি সমকালের ভণ্ডামীর প্রবণতাকে স্পষ্ট করেন ।

প্রসঙ্গত 'ভূত নাবানো' নামক নক্সাটির কথা বলা যায় — ডাক্তার, কবিরাজের চিকিৎসার সঙ্গে ঠাকুর দেবতার পূজা অর্চনা করার পরেও রোগ না সারায় সিদ্ধান্ত হয় যে নিশ্চয় ভূতে ধরেছে। শেষে ওঝা ডেকে আনা হল। মেঠাই, ক্ষীর, লুচি প্রভৃতি খাদ্য ভূতের 'জলযোগে'র ব্যবস্থা করা হয় । ভূত প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে জলযোগে রাজি হয় । কিন্তু হঠাৎ ওলাওঠা রোগীর বমির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। পরে দেখা যায় বমি করছিল ওঝা ও তার সহকারী, কারণ ভূতের জলযোগের খাবারে মেডিকেল কলেজের একটি ছাত্র 'টারটামেটিক' মিশিয়েছিল। ওঝার বুজরুকি ওতেই ধরা পড়ে । এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজের মানুষকে সচেতন করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ।

দেব উৎসবে ভক্তি গৌণ, মুখ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ঃ

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় 'দুর্গোৎসব' 'রামলীলা', 'মাহেশের স্নানযাত্রা', 'কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ', 'কলিকাতার বারো ইয়ারিপূজা'র মতো একাধিক দেব উৎসবের প্রসঙ্গ আছে। শিব, রাম, দুর্গা বা গঙ্গার পূজায় আর সবই আছে, নেই শুধু অন্তরে বিশুদ্ধ ভক্তি। এই সময়ের বাঙালীর একটি শ্রেণী দেবপূজার নামে আমোদ প্রমোদ ও উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রকাশ করত; যা উন্নত ও সুস্থ সমাজ গঠনের অন্তরায়।

প্রসঙ্গত 'মাহেশের স্নানযাত্রা'র কথা বলা যায় । এদেশে গঙ্গা স্নান পবিত্রতা অর্জনের একটি রীতি বা আচার। কিন্তু 'মাহেশের স্নানযাত্রা' পাপ ও পঙ্কিলতাকে অর্জন করার চিত্র বা নক্সা। হুতোমের ভাষায়;—

"গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্‌ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠ্‌চে, কোনটিতে খ্যাম্‌টা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন;" (৪৪)

'মাহেশের স্নানযাত্রা'র নায়ক গুরুদাস বাবুর আয়োজন সবই ঠিক্‌ঠাক্‌ কিন্তু মেয়ে মানুষ না থাকায় তাদের ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। গোপাল বলেছে;—

"দ্যাখ্‌ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, কিন্তু একটার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে; সবই হয়েচে, কেবল মেয়ে মানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না!" (৪৫)

আর এক বন্ধু নারায়ণ বলেছে;—"যে নৌকোখানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরামিষ্‌ষি! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্চি।"(৪৬) বন্ধুদের দ্বারা গুরুদাস উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে অনেক চেষ্টা করেও মেয়ে মানুষের সন্ধান না পেয়ে শেষে তার বিধবা পিসিকে নির্বোধের মতো বলেছিল;—

"পিসি, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়। দেখ পিসি, সকলেই একটি দুটি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কিন্তু পিসি, আমাদের একটিও মেয়েমানুষ জুটে ওঠে নাই — দেখ পিসি, সুদুই বা কেমন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্য যেন না হলো, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদু নিরিমিষ্‌ষি রকম যেতে মন সচ্চে না — তা পিসি আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাধ্যি তোমারে কেউ কিছু বলে।" (৪৭)

এখানে পুণ্য অর্জনের লেশমাত্র লক্ষণ নেই। গঙ্গাস্নান যেন আমোদ প্রমোদের জন্যই একটি উৎসব। ধর্মের নামে চরম উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রকাশ 'মাহেশের স্নানযাত্রা'। কালীপ্রসন্ন সিংহ যেন উৎসবের নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রকাশ করে পাঠককে আত্মসচেতন করাতে চেয়েছেন।

অন্ধবিশ্বাস ঃ

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় মানুষের মনের অন্ধবিশ্বাসের ছবিটি পাওয়া যায় । 'রেলওয়ে', 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা' ও 'কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ' এ মানুষের প্রচলিত আচার রীতি ও অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের অন্তসার শূন্যতা স্পষ্ট হয়েছে। যেমন 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা'য় তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ী গুরুদেবের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'গুরুপ্রসাদী' একটি প্রথা। বিবাহিত নারী কায়মনবাক্যে স্বামী সেবা করার পূর্বে কুলগুরুকে সেবা করার এক জঘন্য রীতি 'গুরু প্রসাদী'। 'গুরুপ্রসাদী' বর্ণনায় লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ তথাকথিত লম্পট

ধর্মগুরু বা ধর্মব্যবসায়ীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। আসলে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'গুরুপ্রসাদী'র মতো কাহিনী চয়ন করেছেন, যাতে পাঠক সচেতন হয় ।

বাবুকালচার ঃ

প্রসঙ্গত পুনরায় উল্লেখ করতে হচ্ছে যে ইংরেজের প্রভাবে এদেশে বাবু নামক একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এদের শিক্ষা-দীক্ষা তথৈবচ। অনেকেই পাশ্চাত্যের বিকৃত সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে ; এরা মদ্যপান, বেশ্যালয়ে গমন, অশ্লীলনাচ-গান প্রভৃতিঅপসংস্কৃতির পোষক। আবার কেউ কেউ ধর্মনাশের আশঙ্কায় আধুনিক প্রগতিশীল ভাবনার বিরোধী। লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুসম্প্রদায়ের এজাতীয় বিকৃত মনোভাব দেখে মর্মাহত। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বিভিন্ন স্থানে উক্ত অপসংস্কৃতির প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমালোচনা আছে। 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার'এ বাবু সম্প্রদায়ের অপসংস্কৃতিকে আঘাত করা হয়েছে। পদ্মলোচন সংকীর্ণ মানসিকতার। তার ইংরেজী বিদ্যায় অনীহা, বিদ্যাসাগরের প্রতি বিদ্বেষ জনিত কারণে সংস্কৃতে অনীহা, ডাক্তারী ঔষধে মদ বা অ্যালকোহল থাকায় ডাক্তারী চিকিৎসার পরিহার প্রভৃতি মধ্যযুগীয় মানসিকতা চোখে পড়ার মতো । এই সব মধ্যযুগীয় মানসিকতা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে অন্তরায়। হুতোম অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলেন;—"যে দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক!" [৪৮] তিনি আরো বলেন;—"এই মহাপুরুষেরাই রিফর্ম্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গসুখসৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট!" [৪৯] —তিনি এইসব ব্যক্তিদের কীটের সঙ্গে তুলনা করে আপামর বাঙালীকে সচেতন করার আহ্বান জানান ।

দেশপ্রেম ও নৈতিকতার অবতারণা ঃ

গ্রন্থকার কালীপ্রসন্ন সিংহ 'ভূমিকা উপলক্ষে একটি কথা'য় লিখেছিলেন;—"কি অভিপ্রায়ে এই নক্‌শা প্রচারিত হলো, নক্‌শাখানির দু-পাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন," [৫০] লেখকের এই বক্তব্যের ভিত্তি যে দেশপ্রেম ও নৈতিকতা সঞ্চয়ের দ্বারা বাঙালী সমাজে মানব সম্পদ বৃদ্ধি করার তাগিদ —সেকথা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশপ্রেম ও নৈতিকতার উদাহরণ তুলে ধরা হল। এদেশের মেয়েদের দুরবস্থার প্রসঙ্গে হুতোম বলেন;—

> "বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা — তবে ক্যান বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝক্‌ড়া ও হিংসায় কাল কাটায় ? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফর্‌নেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ও ভাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটিমাত্র।"[৫১]

কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজ দেশের নারী সম্প্রদায়ের দুর্দশার জন্য গৃহের অভিভাবকের ত্রুটির কথা বলেন। দেশের অর্থশালী ব্যক্তিরা স্বদেশের হিত সাধনের জন্য কাজে আসতে পারেন। কিন্তু সেই অর্থশালী ব্যক্তির সংকীর্ণ মানসিকতা ও সুখ বিলাসিতা লেখককে আহত করে। তাঁর ভাষায়;—

> "হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষেরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে!"(৫২)

এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ অর্থপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির বিপথগামিতায় মর্মাহত হয়েছেন। সমকালে স্বদেশের গৌরবময় বিষয় বলতে ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য। পূর্বকালের গৌরব ও সমকালের কলঙ্কের বিষয়ে বলা হয়েছে;— "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের "খেউড়ে" জিত ধরাই আছে।" (৫৩) উক্ত বক্তব্যে প্রাচীনকালের বাঙালীর বলবীর্যের জন্য গৌরব করা হয়েছে এবং বর্তমানের পরচর্চা ও পরনিন্দা-কলঙ্কের নিন্দা করা হয়েছে। সময় গতিশীল এই চিরন্তন সত্য বাক্যটি হুতোমের ভাষায়;—"সময় কারও হাত ধরা নয়; সময় জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুই অপেক্ষা করে না।" (৫৪) এই বক্তব্য পাঠককে যেন সময়ের সৎব্যবহার করার নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করে।

অতএব সিদ্ধান্তে আসা যায়, পাঠককে আত্মদর্শন করিয়ে আত্মসচেতন করাই 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্দেশ্য। সেজন্য গ্রন্থটিতে সমাজ সচেতনতা, নৈতিকতা, দেশানুরাগ প্রভৃতি ইতিবাচক দিক থাকবে — একথা বলাই বাহুল্য।

সমগ্র আলোচনার শেষে বলা যায় — নক্‌সা বা নক্‌সা জাতীয় রচনা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণ কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির মতো স্বীকৃত সাহিত্য প্রকরণ বা কুলীন সাহিত্য প্রকরণ নয়। কিন্তু তবুও উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করতে গিয়ে নক্‌সাকে গুরুত্বসহকারে পৃথক একটি অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ উনিশ শতকের এই শ্রেণীর রচনাতেই স্পষ্টত সাহিত্য রসের চাইতে সমাজ কল্যাণ বা দেশ কল্যাণের উদ্দেশ্য গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের নক্‌সা বা নক্‌সা জাতীয় রচনার দ্বারা লেখকের সমাজ কল্যাণ বা দেশকল্যাণের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পেয়েছি। নক্‌সা রচয়িতার এই ইতিবাচক মানসিকতা উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ভূমিকা, নব বাবু বিলাস, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং ১: নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নব সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯, পৃ: ৫।

২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৩। নব বাবু বিলাস, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং-১—নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয় — ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নব সংস্করণ — সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯, পৃ: ৩০।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৬। নব বিবি বিলাস, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং-১ — নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নব সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯, পৃ: ৯৭-৯৯।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮।

৯। কলিকাতা কমলালয়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং-১—নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নব সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯, পৃ: ১০৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১২-১১৩।

১৩। Preface, আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ—১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃ: ৩।

১৪। আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ — ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃ: ১৫।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।

২০। ভূমিকা, আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ—১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃ: ৩।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৫।

২৪। মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ—১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃ: ১৪১।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫২।

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৬।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৪-১৪৫।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৪।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮।

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২।

৩২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৮ম খণ্ড (বঙ্কিম পর্ব)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯৮, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১৪৩।

৩৩। ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৪।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

৩৫। দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৩৮। হুজুক, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৫৮।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮।

৪০। মরাফেরা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৭০।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১।

৪৩। বুজরুকি, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৮৯।

৪৪। মাহেশের স্নানযাত্রা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১২৪।

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৮।

৪৮। হঠাৎ অবতার, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১১৮।

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৯।

৫০। ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৩।

৫১। কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা, ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৫২।

৫২। হঠাৎ অবতার, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১০৯।

৫৩। রামলীলা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৫২।

৫৪। হুজুক, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৭৯।